অন্বেষণ

লেখক ও গবেষক
প্রণয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অবতারজননী শচীমাতা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়া জেলার জনপদ নবদ্বীপ ছিল নব্যন্যায় চর্চার পীঠস্থান। বিদ্যাই ছিল নবদ্বীপের উৎসব ও আনন্দ। মুসলমানের অত্যাচারে সেইসময় ঢাকার কাছাকাছি শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলা থেকে বহু হিন্দু পরিবার চলে এসেছিল নবদ্বীপে। শোভা দেবী ও উপেন্দ্র মিশ্রের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ নবদ্বীপে এসে বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'পুরন্দর' উপাধি পেয়েছিলেন। সুপণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তীও শ্রীহট্ট থেকে এসে বাস করছিলেন নবদ্বীপের বেলপুকুরে। জ্যোতিষচর্চায় তাঁর খ্যাতি ছিল বিপুল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী বিলাসিনী দেবী যখন নবদ্বীপে আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কন্যা শচীও। শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার জয়পুর গ্রামে শচী দেবীর জন্ম—এমনটাই জানা যায় জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে। অবশ্য সেখানে শচী দেবীর জন্মভিটের কোনও চিহ্ন আজ আর মেলে না। জানা যায়, নীলাম্বর চক্রবর্তীর পূর্বনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার মগডোবা গ্রামে।

শচী দেবীরা ছিলেন দুবোন, দুভাই। ছোট বোন সর্বজয়া; দুই ভাই রত্নগর্ভাচার্য ও যোগেশ্বর পণ্ডিত। নীলাম্বর তাঁর বড় মেয়ে শচীর জন্য পাত্র

স্থির করলেন তাঁরই টোলের ছাত্র পণ্ডিত ও রূপবান যুবক জগন্নাথকে। শচী দেবীর রূপ-লাবণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু জানা যায় জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন পরম রূপবান। নবদম্পতি বিবাহের পর রইলেন নবদ্বীপেই। বিবাহের সাল-তারিখ জানা যায় না। তাঁদের উপর্যুপরি প্রথম আটটি কন্যা শৈশবেই মারা যায়। শচী দেবীর নবম গর্ভের পুত্র বিশ্বরূপ, দশম গর্ভের পুত্র বিশ্বম্ভর—পরে শ্রীচৈতন্যদেব।

শচী দেবীর জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব ইতোমধ্যেই আলোচিত। মধ্যম বা দ্বিতীয় পর্বটি দীর্ঘ এবং তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বটি ক্ষুদ্রতম।

শচী একইসঙ্গে ভাগ্যবতী আবার ভাগ্যহীনা। অবতারপুরুষকে যিনি পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন তাঁর চেয়ে ভাগ্যবতী আর কে! আবার যাঁর আট কন্যা মৃত ও দুই পুত্রই সন্ন্যাসী, অর্থাৎ দশটি সন্তানের জননী হয়েও যিনি প্রত্যেক সন্তানের বিয়োগদুঃখ সহ্য করেছেন, তাঁর অন্তরের বেদনা কোনওভাবেই পরিমাপযোগ্য নয়।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত' পর্যালোচনা করে মনে হয় শচী দেবীর জন্মসাল সম্ভবত ১৪৪১ বা ১৪৪২। [কেননা, জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর সময় নিমাইয়ের বয়স আন্দাজ এগারো এবং শচীর বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন বলে উল্লিখিত হয়েছে। নিমাইয়ের জন্মসাল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ বলে স্বীকৃত।] অনুমান, শচী দেবীর বিবাহ হয়েছিল ১৪৫৮ সাল অথবা তার আগে; তখন তাঁর বয়স সতেরোর নিচে।

নিমাই গর্ভে ছিলেন তেরো মাস। ''চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।/ পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥'' (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি খণ্ড) ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে মহাপ্রভুর আবির্ভাব। সেদিন ছিল দোলপূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ। তাঁর জন্মকালে চারদিকে হরিনাম সংকীর্তন চলছিল। প্রসূতির কাছে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের স্ত্রী মালিনী দেবী। নিমের তিক্ত স্বাদ যমরাজকে প্রতিহত করবে—এই আশায় মা ছেলের নাম রাখলেন নিমাই। শিশুর দেহে বত্রিশটি মহাপুরুষলক্ষণ দেখেছিলেন শচীর পিতা নীলাম্বর; তাঁর গণনায় গৌরাঙ্গের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধরা পড়েছিল।

তেরো মাস গর্ভে থাকায় সদ্যোজাত শিশু নিমাইয়ের চেহারা ছিল আর পাঁচটা শিশুর চেয়ে বড়সড়, সেইসঙ্গে বলবান ও চঞ্চল। তার গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মতো। তার হামাগুড়ি দেওয়ার অপূর্ব দৃশ্য দেখবেন বলে মা তাকে আঙিনায় ছেড়ে দিতেন। তার চঞ্চলতা শান্ত করতে 'হরি হরি' বলতেন; ছেলেও সে-ওষুধে স্থির হয়ে যেত।

দেবশিশুকে কতক্ষণই বা কাছে পান শচীমা। কারণ তার নাচ দেখতে, তাকে একবার কোলে নিতে সকলেই ব্যাকুল। এদিকে গৌরাঙ্গের জন্মের পর থেকেই শচীমার নানারকম অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতি হতে লাগল। একদিন কোলে ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে বসেছেন। হঠাৎ মনে হল, যেন কত জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁর পুত্রকে ঘিরে দণ্ডায়মান। আবার একদিন শিশু হাঁটছে। মা তার শূন্য পায়ে অতি মধুর নূপুরের ধ্বনি শুনতে পেলেন। শচীমা এসব দেখেশুনে ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তিত হন। নিমাই একটু বড় হলে সঙ্গীদের নিয়ে সারাদিন খেলা করে বেড়ায়। সন্ধ্যা হলে যখন মায়ের কোলে এসে বসে তখন মায়ের বড় সুখের সময়। মায়ে-পোয়ে খেলার দৃশ্য বাসুদেব ঘোষ লিখছেন, ''শচীর আঙিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।/ হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥/ বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।/ শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥/ মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।/ নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে॥''

চার বছর বয়স এখন নিমাইয়ের। শচীমা বলছেন, ''তুই আমার পাগল ছেলে।'' নিমাই

অমনি জবাব দিল, ''আমি পাগল নই মা, আমি ছাড়া আর সকলেই পাগল।''

নিমাই এখন পাঁচ। মাকে ভয় পায় না মোটেই। মায়ের সে পরাণপুতলি। তার দৌরাত্ম্য, চপলতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শাসন করেও পেরে ওঠেন না শচীমা।

নিমাই ছয়। শচী দেবীর দুই পুত্রের বয়সের ব্যবধান মোটামুটি দশ বছর। বড় ছেলে পরম পণ্ডিত বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী হলেন ষোলো বছর বয়সে। মা এবার শিবরাত্রির সলতে নিমাইকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন। আট বছর বয়সে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হল নিমাই। কিন্তু পাছে পণ্ডিত হয়ে শেষে সেও তার অগ্রজের পথ অনুসরণ করে সেই ভয়ে তার পড়াশোনা বন্ধ করে দিলেন জগন্নাথ মিশ্র। নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য চরমে উঠল। ''শচী প্রতি যত নিমাই করে অত্যাচার।/ সেসব শচীর কাছে সুখের পাথার॥/ যেই মাত্র সাজায়েন সোনার তনয়ে।/ অমনি মায়েরে হেসে ধূলা মাখে গায়ে॥'' (বলরাম দাস) শচীমা স্বামীর সঙ্গে তর্ক করে ছেলের পড়াশোনা আবার শুরু করালেন।

নয় বছর বয়সে নিমাইয়ের উপনয়ন হল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। সেসময় মুণ্ডিতমস্তক নবীন ব্রহ্মচারী নিমাই মাকে বললেন, ''মা, তুমি আর একাদশীর দিন অন্নগ্রহণ কোরো না।'' সেই থেকে শচীমা শুরু করলেন একাদশীর ব্রত পালন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নিমাইয়ের পিতৃবিয়োগ (১৪৯৬) হল। পঞ্চান্ন বছর বয়সে শচীর জীবনে নেমে এল বৈধব্য। এরপর থেকে নিমাই পণ্ডিতের টোল খুলে উপার্জনশীল হওয়া পর্যন্ত মোটামুটি ছয় বছর কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিমাইকে বড় করে তুলেছেন একা শচীমা।

নিমাইয়ের টোলের পড়া শেষ হল। ইতোমধ্যে তিনি ব্যাকরণ ও ন্যায়ের টিপ্পনী লিখে ফেলেছেন। অধ্যয়নের পর অধ্যাপন। নবদ্বীপে পণ্ডিতের অভাব নেই। তবু নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের আলো যেন গোটা নবদ্বীপকে নতুন করে বিভাসিত করল। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন নিমাই। এত কম বয়সে টোল খোলার নজির নেই। তবু শচীমার বুক দুরুদুরু করে। বিশ্বম্ভরের মতিগতি যেন তার দাদার মতো না হয়!

নতুন শতাব্দীতে পা রেখেছে পৃথিবী। ১৫০২ সাল। ষোলো বছরের সদ্যোযুবক নিমাই। ঠিক এই বয়সেই গৃহত্যাগ করেছিলেন বিশ্বরূপ। কাজেই এখন প্রাণের নিমাইকে সংসারে বাঁধতে চাইলেন শচীমা। বল্লভাচার্যের পরমাসুন্দরী কন্যা লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহ স্থির করলেন। গৃহে আবার আনন্দধ্বনি জাগল। মায়ের ইচ্ছা পূরণ করে সংসারী হলেন নিমাই। কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার বাঁকবদল। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল নিমাইয়ের। তারপরেই তাঁর মধ্যে হাস্য, রোদন, মূর্ছা, বিহ্বলতা প্রকাশ পেতে লাগল। দুশ্চিন্তায় অধীর হলেন মা। বায়ুরোগ ভেবে বিষ্ণুতেল মাখানো হল। ক্রমে পুত্র সুস্থ হয়ে উঠলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শচীমা। সে-যাত্রা পুত্র সুস্থ হল বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে বধূটি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিল।

মেঘ যেমন সূর্যকে আড়াল করে তেমনি আড়াল আবার সরিয়েও নেয়। আঠারো বছরের তরুণ পুত্রের রূপ ও গুণের জয়জয়কার। নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত এখন তাঁর নিমাই। দেখে শুনে শচীমার বুক ভরে ওঠে। নিমাই পণ্ডিতের কাছে বিদ্যালাভকে শিক্ষার্থীরা বড় সৌভাগ্য মনে করে। শচী দেবীর ঘরে এখন দারিদ্র্য বিদায় নিয়েছে। অতিথি সমাগম লেগেই আছে।

সাল ১৫০৭। নিমাই এখন একুশ। ছেলের আবার বিবাহ দেবেন শচী। নিজেই পছন্দ করেছেন পাত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে। ধনী সনাতন মিশ্রের কন্যা। সুন্দরী, সুলক্ষণা। বয়স এগারো। বৈদিক শ্রেণির

কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁদের পালটি ঘর। নিমাইও বৈদিক শ্রেণির কুলীন ব্রাহ্মণ। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয়, কিন্তু মুরারি গুপ্তের কড়চায় তাঁকে বাৎস্য গোত্রীয় বলা হয়েছে। ঘটক কাশীনাথ মিশ্রকে শচী পাঠালেন সনাতন মিশ্রের কাছে। প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন সনাতন।

বিবাহের মস্ত আয়োজন শুরু হয়ে গেল। নবদ্বীপের শীর্ষস্থানীয় ধনীর কন্যার বিবাহ শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতের সঙ্গে। জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ শচীমাকে বললেন, বিয়ের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। শেষে এমন আয়োজন হল যে রাজপুত্রের বিবাহও হার মেনে যায়। নবদ্বীপে কেউ কখনও এমন বিবাহ দেখেনি। খাদ্যবস্ত্র দেদার বিতরণ করা হল। 'চৈতন্যভাগবত'-এ বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর যত দ্রব্যাদি অবশিষ্ট রইল তা দিয়ে আরও পাঁচটি বিবাহ হতে পারত। ছেলের বিয়েতে শচীমা প্রাণভরে আনন্দ করলেন। নবোঢ়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে যখন মায়ের কাছে নিমাই এলেন তখন শচীমা তাঁর বধূরত্নটিকে শত চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন। ''বধূ কোলে করি তবে শচীর নাচন।'' (লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল)

কিছুকাল পর মায়ের কাছে গয়া যাত্রার অনুমতি নিলেন নিমাই। সেখানে ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কানে দশাক্ষরী মন্ত্র দিলেন। নিমাই নবদ্বীপে ফিরলেন এক নতুন মানুষ হয়ে। অধ্যাপনার বদলে এখন শুধুই সংকীর্তনে অনুরাগ। জ্ঞানমার্গ থেকে ভক্তিমার্গে ঘটল পদার্পণ। কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ারে ভেসে গেল পাণ্ডিত্য। তিনমাস পর পুত্রমুখ দর্শন করে শচীমা পুলকিত হলেন বটে, কিন্তু এ কোন নিমাই! ''গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।/ সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল॥'' ছেলের ভাবসাব কিছুই বুঝতে পারেন না মা। বুঝবেন কীভাবে! মায়ের কাছে তো ছেলে সবার আগে ছেলেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, তাঁর এই সন্তান নিছক মানুষী মায়া নয়। মায়াতীত হয়ে তিনি মায়াপুরীতে ধরা দিয়েছেন। নিমাইয়ের মধ্যে তখন ভগবৎসত্তা প্রকাশিত হচ্ছে। এদিকে শচীর বিশ্বাস, নিমাই সরল মানুষ বলে ভক্তরা তাকে নাচিয়ে গাইয়ে ভগবান বানাতে চান। এই সময় এলেন নিতাই—নিত্যানন্দ। মায়ের কাছে নিতাইকে এনে নিমাই বললেন, ''মা, এ আমার বড় ভাই। তোমার বড় ছেলে বলেই একে জেনো।'' সরলা শচীর দুটি চোখ ভেসে গেল জলে। কাঁদতে কাঁদতে নিতাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ''বাবা, আজ আমার নিমাইয়ের জন্য ভাবনা দূর হল। ভাইটিকে তুমি যত্নে রক্ষা কোরো।'' ''নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরাণী।/ নয়নে গলয়ে নীর গদগদ বাণী॥/ এই মত স্নেহ-রসে সব গরগর।/ দুই পুত্র দেখি শচী জুড়ায় অন্তর॥'' (চৈতন্যমঙ্গল)

এসময় শচীর মাতৃজীবনে এমন এক ঘটনা ঘটে যা সাধারণভাবে আর কখনও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। তবে তার আগে পুত্র সম্পর্কে মা শচীর ভাবনা আরও একটু বিশদ করা প্রয়োজন। এজন্য আমরা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' (প্রথম খণ্ড) থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করব : ''শচী দেখিতেছেন, তাঁহার নিমাই বটে, তবে নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন, স্বয়ং শ্রীভগবান। ইহা দেখিয়া শচী সুখী না হইয়া কাতর হইলেন। তাঁহার কাতর হইবার অনেক কারণ ছিল। যখন বুঝিলেন যে, নিমাই তাঁহার পুত্র নহেন, তখন চারিদিকে শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। চিরদিন পুত্রটিকে লালন-পালন করিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, আর পুত্রটি রূপে গুণে অতুল্য। কাজেই তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। এখন দেখেন যে, সেই প্রিয় বস্তুটি তাঁহার নিজস্ব ধন নহে। ত্রিজগতের সকলেই তাঁহার উপর দাবী রাখে। সেটি বহুবল্লভ। তিনি পুত্রের একমাত্র সম্বল নহেন, পুত্রটির সম্বল ত্রিজগতের তাবল্লোক। একে সেই চিরদিনের

হৃদয়ের প্রাণ-পুত্তলিটি চলিয়া যাইতেছে, আবার সেই ভগবানকে পুত্রভ্রমে নানারূপে শাসন করিয়াছেন—এইরূপ বিবিধভাবে অভিভূত হইয়া, শচীদেবী একেবারে জড়বৎ হইয়া পড়িলেন।"

এবার সেই ঘটনা। একদিন শ্রীবাস এবং অদ্বৈত আচার্য শচীমাকে ডেকে আনলেন পুত্রের কাছে। উদ্দেশ্য, গৌরাঙ্গের মহাভাব দর্শন করানো। সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধা জননী গলায় আঁচল দিয়ে তেইশ বছরের নিমাইকে প্রণাম করলেন। ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত নিমাই প্রণত শচীর মস্তকে পদস্থাপন করে বললেন, ''তোমার বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় হোক।"

শচীমা ছিলেন রন্ধনপটীয়সী। নানারকম শাকের রান্না তিনি জানতেন। নিমাইও শাক খুব পছন্দ করতেন, বিশেষত নালিতা শাক। শচী অনেক সময় বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়েও রান্না করিয়ে পুত্রকে খাওয়াতেন, বধূমাতার প্রতি পুত্রের মনোযোগ আকর্ষণের প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। নিমাই মাকে খুশি করতে চাইলেও ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিলেন মায়ের কাছে। একদিন ছেলেকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে ফেললেন শচী যে, সন্ন্যাসই তার অভীষ্ট কী না। উত্তরে নিমাই আশ্বস্ত করলেন মাকে—কোথাও গেলে তিনি মায়ের অনুমতি নিয়েই যাবেন।

এমন সময় কাটোয়ার কেশব ভারতীর আগমন ঘটল নদীয়ায়। তাঁর সাক্ষাৎ হল নিমাইয়ের সঙ্গে। এতদিন নিমাই নামসংকীর্তন নিয়ে মেতে ছিলেন। এবার সন্ন্যাসীর আগমনে শচী বিপদের গন্ধ পেলেন : ''বড় সাধ ছিল মনে নদিয়া-বসতি।/ কাল হয়ে এল মোর কেশব ভারতী॥" নিমাইও মায়ের কথা ভেবে ঘরে থাকতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু উপলব্ধি করলেন, সন্ন্যাস না নিলে মানুষ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে না; কারণ তাঁর পত্নী আছেন, ভক্তেরা ভগবদ্‌বুদ্ধিতে অবিরাম তাঁকে ক্ষীর-ননী উপহার দেন—এই পরিস্থিতিতে তাঁর মুখে হরিনাম লোকচক্ষুতে ভক্তি-বৈরাগ্যের তাৎপর্য বহন করবে না। তিনি গৃহত্যাগ করে জনচিত্তে হরিনামের বীজ বপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সঙ্গীদের বললেন, ''নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।/ দেখিবারে যাব যথা বৃন্দাবন ভূমি॥"

গৌরপ্রেমে বিভোর শ্রীবাসাদি ভক্তেরা কিছুতেই তাঁদের নয়নমণিকে বোঝাতে না পেরে ধরলেন শচীমাকে। শচীমা ছেলের কাছে আশ্বাস পেলেও ভয় মুছে ফেলতে পারেননি। ঘুমের মধ্যে ছেলের গৃহত্যাগের দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠেন। এ-অবস্থায় একথা শুনে পাগলিনীর দশা হল তাঁর। ছেলের কাছে গিয়ে বললেন, ''সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।/ অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও॥" (লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল) বেদনায় কাতর হয়ে মা বললেন, নিমাইয়ের নাকি সর্বজীবে দয়া! শুধু মায়ের জন্য কি তার হৃদয়ে এতটুকু মমতা নেই! শেষে বললেন—আমি না হয় তোমার অদর্শনে মরব। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া? তার কী হবে?

মায়ের এই মর্মান্তিক দুঃখ মাতৃবৎসল নিমাইয়ের পক্ষেও দুঃসহ। কিন্তু এর কোনও জবাব তাঁর ভাণ্ডারে নেই, দুচোখে শুধু ঝরে পড়ছে জল। কোনওরকমে বললেন, ''মা, তুমি এই অধম সন্তানকে ক্ষমা কোরো। আমি বৃন্দাবন যাব মা। আমাকে অনুমতি দাও। তোমার অনুমতি ছাড়া আমি কোথাও যাব না।"

মা বলছেন, তোমার সন্ন্যাসজীবনের কষ্ট আমি কেমন করে সইব? ''এহেন কোমল পায় কেমনে হাঁটিবে।/ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাঙ্গিবে॥/ ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।/ কেমনে সহিবে ইহা এ দুঃখিনী মায়॥" (চৈতন্যমঙ্গল)

নিমাই বললেন, ''মা, সন্ন্যাস নিলে তোমার নিমাইয়ের মঙ্গল হবে। তুমি কি তা চাও না?" এই কথায় কার্যসিদ্ধি হল। চমকে উঠলেন শচীমা। নিজেদের কষ্ট দূরে থাক, তার বিনিময়ে নিমাইয়ের

সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল যদি সন্ন্যাসেই হয় তবে আর বাধা দেওয়া কেন। বললেন, ''মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলে মোর বশ।/ এখন আপন সুখে করগে সন্ন্যাস॥''

নিমাইকে অনুমতি দিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে মূর্ছিত হলেন শচীমা। পরে জ্ঞান ফিরলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জননী অনুমতি ফিরিয়ে নিলেন না। নিমাই মাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, ''আমি সন্ন্যাসী হলেও তুমি আমার মা-ই থাকবে চিরকাল। কোটিকল্পেও তোমার ঋণশোধের ক্ষমতা আমার নেই।'' আশ্বাস দিলেন মাকে, ''তোমার সাংসারিক ও পারমার্থিক সমুদয় ভার আমার উপরে রইল।''

আরও দেড়মাস সংসারে রইলেন নিমাই, তারপর ১৫১০ সালে ২৯ মাঘ শেষরাতে গৃহত্যাগ করলেন। ভোররাতে ঘুম ভেঙে যখন বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচী দেখলেন নিমাই নিরুদ্দেশ, তখন দুজনে প্রদীপ হাতে পথে পথে খুঁজে সারা হলেন। তীব্র হাহাকার ছড়িয়ে পড়ল নবদ্বীপ জুড়ে। বাসুদেব ঘোষ লিখেছেন, ''শচী কান্দে বাইরে পড়ি।'' সে দুঃসহ দৃশ্য বর্ণনার অতীত। শচী দেবীর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব এখানেই শেষ।

শচীমার জীবনে এখন হারানোর মতো আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। স্থির হয়ে বসে থাকেন, কথা ফোটে না। নির্বিকার তাকিয়ে থাকেন, পলক পড়ে না। যেন নিষ্প্রাণ একটি অবয়ব। পৃথিবীর সবই তাঁর কাছে মিথ্যা হয়ে গেল। দ্যুলোক ভূলোক জুড়ে এতবড় অনাথিনী কেউ কখনও দেখেনি। নবদ্বীপ থেকে পাঁচজন কাটোয়ার দিকে গেলেন। তাঁরা নিমাইকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন শচীমাকে। এই দলে ভগ্নীপতি চন্দ্রশেখরকে পাঠালেন শচী। কারণ, সকলের উপর তাঁর ভরসা নেই। সবাই মিলে নিমাইকে পাগল করে ঘর ছাড়িয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু কিছুদিন পর ব্যর্থ হয়ে চন্দ্রশেখর ফিরে এলেন। শচীমার শূন্য হৃদয় হাহাকারে ফেটে পড়ল।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই এলেন শান্তিপুরে, অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে। নিতাই অমনি ছুটে এলেন নবদ্বীপে, সেই সংবাদ দিতে। শচীমাকে তিনি নিয়ে যাবেন পুত্রসন্দর্শনে। দোলায় চড়ে নবদ্বীপ থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে শান্তিপুরে গেলেন জননী। সন্ন্যাসী নিমাইকে প্রথম দেখলেন শচীমা। পুত্র মাকে প্রণাম করলেন, প্রদক্ষিণ করে স্তবস্তুতি করলেন। বাৎসল্যরসে অভিভূত জননী পুত্রকে প্রাণভরে নিরীক্ষণ করছেন। মাতাপুত্রের মিলনের সেই মধুরতম দৃশ্য নিরীক্ষণ করছে উপস্থিত জনতা। মা দেখছেন, উজ্জ্বল, অপূর্ব, রূপলাবণ্য সুষমাময় দেহে তাঁর সন্তান। আজ সে নবদ্বীপের 'পরাণের পরাণি'। আশ মিটিয়ে রান্না করে পুত্রকে ভোজন করালেন শচীমা। ''শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।/ ভোজন করয়ে পূর্ণ হৈল নিজ সুখ॥'' (চৈতন্যচরিতামৃত)

শান্তিপুরে দশদিন ছিলেন নিমাই। চলে যাওয়ার আগে মায়ের কাছে পাঠালেন নিতাইকে। মায়ের কী ইচ্ছা, কী আদেশ, জানতে ব্যাকুল ছেলের প্রাণ। সবাই ভাবল, এই সুযোগে মা নিশ্চয়ই নিমাইকে নবদ্বীপবাসী হতেই আদেশ দেবেন। কিন্তু তিনি নিমাইয়ের গর্ভধারিণী। সেই যোগ্যতায় অনন্যা শচীমা নির্লিপ্তচিত্তে জানালেন, পুত্রের সন্ন্যাসধর্ম নষ্ট হোক তা তিনি চান না। বৃন্দাবন নয়, নিমাই নীলাচলে বাস করুক যাতে সবসময় ছেলের খবরটুকু পেতে পারেন তিনি। মায়ের আদেশ মেনে নিমাই তাঁর জীবনের দ্বিতীয়ার্ধের চব্বিশ বছর নীলাচলেই বাস করেছিলেন।

নিমাইয়ের নবদ্বীপ ত্যাগের পর দু-বছর কেটে গেছে। কিন্তু মায়ের যে বদল হয় না! প্রতিদিন আকাশে নতুন সূর্য ওঠে। শচীমা নতুন করে উতলা হন। রোজই ভাবেন, নিমাই আসবে। রোজ রাতে একই স্বপ্ন দেখেন। একদিন তো স্বপ্নের ঘোরে

একেবারে শ্রীবাসের বাড়িতে উপস্থিত। ''মালিনী গো, নিমাই কি তোমাদের বাড়ি এসেছে?''

১৫১২ সালে দক্ষিণদেশ ভ্রমণ সেরে নিমাই ফিরে এলেন নীলাচলে। ফিরেই পরমানন্দপুরীকে পাঠিয়ে সেই সংবাদ দিলেন মাকে। মায়ের জন্য প্রসাদও পাঠালেন। মায়ের চোখ না দেখুক, কান তো শুনল ছেলের কথা, তাতেই বা সুখ কম কী! ছেলের খবর 'শুনি আনন্দিত হল শচীমাতার মন।' শচীমা বললেন, ''নিমাই আমার ভুলে যাওয়ার ছেলে নয়।'' খবর রাষ্ট্র হতে সময় লাগল না। নবদ্বীপবাসী এই একটি খবরে জেগে ছুটে এল শচীমার কাছে। আনন্দে উৎসব শুরু হয়ে গেল। শেষে নবদ্বীপ থেকে দুশো লোক চলল নীলাচলে। শচীমা শ্রীবাসের মাধ্যমে পুত্রের কাছে মিনতি পাঠালেন, নিমাই যেন একবার দেখা দিয়ে যান।

চার মাস নীলাচলে থাকার পর নবদ্বীপবাসীরা স্বধামে ফিরল। তারা ফিরে আসার আগে নিমাই শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন, ''মাকে বোলো, আমি অবোধ শিশু, মাতৃসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমাকে যেন তিনি ক্ষমা করেন।'' এই বলে মায়ের জন্য বহুমূল্য প্রসাদি বস্ত্র ও আরও নানারকম জিনিস পাঠালেন। চরম দিব্যোন্মাদ অবস্থাতেও কোনওদিন মাকে ভোলেননি নিমাই।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর একবার জন্মভূমি দর্শনে যেতে হয়। এবার নিমাই জননী ও জন্মভূমি দর্শনে যেতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু বঙ্গভূমে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এমন বিপুল লোকসমাগম হল যে, মনে হল তেত্রিশ কোটি দেবতা বোধহয় মনুষ্যরূপ ধরে নিমাইকে ঘিরে রেখেছে। তিনি নবদ্বীপে একবার নিজ গৃহপ্রাঙ্গণাদি ঘুরে চলে গেলেন শান্তিপুরে। সেখানে শচীমাকে আনা হল মহাসমাদরে। মহোৎসব উপলক্ষ্যে তিনিই রান্নার ভার নিলেন। তখন তিনি সত্তর বছরের বৃদ্ধা। মাতাপুত্রের এই শেষ মিলন।

চৈতন্যদেব ১৫১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃন্দাবন যাত্রা করে নীলাচলে ফিরলেন ১৫১৫-র এপ্রিলে। পাঁচ মাসের মাথায়, সেপ্টেম্বরে আবার চললেন বৃন্দাবন। ১৫১৬-র জুলাইয়ে ফিরলেন শ্রীক্ষেত্রে। তার কিছুদিন পর নিতাইকে পাঠালেন নবদ্বীপে। শচীমা তাঁর মুখে ছেলের কথা শোনেন। দিবানিশি শুনেও সেকথা ফুরোতে চায় না।

নবদ্বীপে শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দেখাশোনা করেন ভৃত্য ঈশান এবং বংশীবদন ঠাকুর। দামোদর পণ্ডিতকেও চৈতন্যদেব নিযুক্ত করলেন মায়ের দেখাশোনা ও সংবাদ আদানপ্রদানের কাজে। শচী দেবীর অর্থকড়ির তখন অভাব ছিল না। নবদ্বীপবাসী ভক্তেরা তাঁদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নিমাই দামোদরকে পাঠালেন মায়ের কাছে, সঙ্গে দিলেন নানা জিনিস। কয়েক মাস পর দামোদর আবার ফিরলেন নীলাচলে। নিমাইয়ের জন্য নিয়ে এলেন মায়ের পাঠানো নানা জিনিস। এইভাবে দূরে থেকেও মায়ে-পোয়ে সম্পর্ক রক্ষা হত। উভয়ের প্রাণে স্বস্তিবিধানও হত। শচীমার পাঠানো দ্রব্যে নিমাই মায়ের স্পর্শ পেতেন, আবার নিমাইয়ের পাঠানো দ্রব্যে ছেলের স্পর্শ পেয়ে মায়ের প্রাণ জুড়াত। নবদ্বীপ ও শ্রীক্ষেত্রের মাঝে ছয়শো কিলোমিটার দূরত্ব লুপ্ত হত এভাবেই।

কখনও কখনও জগদানন্দকেও নিমাই পাঠান মায়ের কাছে। সঙ্গে দিয়ে দেন নানা উপহার, শাড়ি আর মহাপ্রসাদ। শচীমাও তাঁর হাত দিয়ে স্বহস্তে নববস্ত্রে তৈরি কাঁথা পাঠিয়ে দেন ছেলেকে।

শচীমার শেষজীবনের কাহিনি মানুষের অসীম উপেক্ষা ও অনাদরের অন্ধকারে এমনভাবে ঢাকা পড়ে গেছে যে, তা উদ্ধার করা আজ হয়তো অসম্ভব। তাঁকে নিয়ে পৃথকভাবে কোনও লেখা দূরের কথা, তাঁর শেষজীবনের যথাযথ বিশদ তথ্যাবলিও লিপিবদ্ধ করে রাখেনি কেউ। ভাবী কাল এই অকারণ অপরিসীম অনীহাকে ক্ষমা করবে না।

এই উপেক্ষা শুধু বিস্ময়কর নয়, পরম পরিতাপের বিষয়। উপেক্ষা এতটাই যে, শচীমার আয়ুষ্কালটুকুও ধোঁয়াশায় ভরা। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি মানুষের জন্মসাল ও মৃত্যুসাল দুটোই অজানা রয়ে গেল। ১৫৩৩ সালের ৯ জুলাই নীলাচলে নিমাইয়ের অন্তর্ধানের সময় শচীমা জীবিত থাকলে তখন তিনি নবতিপর। 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে লেখা হয়েছে, ''বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ছা গেল শচী ঠাকুরাণী।'' তাহলে তখন শচীমা জীবিত। এর কিছু পরেই পুত্রশোকের অভিঘাতে তাঁর দেহত্যাগ। কিন্তু সাল-তারিখের উল্লেখ নেই। অথচ নবদ্বীপ গিয়ে সেখানকার পণ্ডিত সমাজের বর্ষীয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে দেখেছি, তাঁদের স্থির বিশ্বাস, শচীমা মোটেও অতদিন জীবিত ছিলেন না। সন্তান অন্তপ্রাণ শচী দেবী পুত্রের দীর্ঘ অদর্শনে শোকাহত হয়ে ইতঃপূর্বেই প্রয়াত হন। 'ভারতের সাধিকা' গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনালোচনা প্রসঙ্গেও অনুরূপ ঘটনাই সমর্থিত হয়েছে।

নিমাইয়ের গৃহত্যাগের সময় শচীমার বয়স মোটামুটি আটষট্টি বছর। যদি আরও বিশ বছর তিনি বেঁচে থাকেন তবে সেই দীর্ঘ সময় তাঁর যত্ন ও সামগ্রিক প্রতিপালনের কাজটি নিষ্ঠাভরে করেছেন তাঁর পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। শচী দেবীর প্রতি নবদ্বীপের মানুষজনের কোনও অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান ছিল বলে শোনা যায় না। বরং বাড়িতে ভক্ত-বৈষ্ণবের আগমন লেগেই থাকত। অবশেষে যখন শচীমার অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে আসে তখন সংবাদ পেয়ে গোটা নবদ্বীপের লোক ভেঙে পড়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া সবসময়ে তাঁর কাছেই থাকতেন, প্রিয় শ্বশ্রূমাতাকে সযত্নে আগলে রাখতেন। হরিনাম সংকীর্তন সহযোগে গৌরবন্দনা চলত। একেবারে শেষ অবস্থায় শচীমার ইচ্ছানুসারে দিব্যযানে ফুল দিয়ে সাজিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গাতীরে। অন্তর্জলি যাত্রা। শেষ বিদায়ের সময় শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। শচীমার প্রয়াণের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর গৃহভৃত্য ঈশানেরও মৃত্যু হয়।

যেকোনও পরিবারের ভরকেন্দ্র হলেন মা। নাবালক নিমাই পিতৃহীন হওয়ার পরেও মায়ের যত্নে তিনি সর্বজনবিদিত পণ্ডিত হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, শচীমা একজন নারী বা একজন মা মাত্রই নন। তিনি নিজেই একজন আইকন। তাঁকে মা যশোদার সঙ্গে তুলনা করা হয়। চৈতন্যভাগবত লিখেছেন—''দ্বিতীয় দেবকী যেন সেই জগন্মাতা॥'' মহাপ্রভু নিজে শান্তিপুর বাসকালে তাঁর জননীর স্তুতি করে বলেছেন, ''যে-গঙ্গা, যে-তুলসী অন্যকে পবিত্র করে তারাও তোমার পরশে ধন্য হয়। আমার যা কিছু কৃষ্ণভক্তি সবই তোমার দয়ায় সম্ভব হয়েছে। তোমার নাম যে উচ্চারণ করবে তার সংসারবন্ধন ঘুচে যাবে।'' ["প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।/ কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার॥/... বারেক যেজন তোমা করিবে স্মরণ।/ তার কভু নহিবেক সংসারবন্ধন॥/ সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।/ তানাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি॥" (চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়)] পদকর্তা বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, ''আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে।/ গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার উদরে॥/ প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।/ 'আই' শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥" (চৈতন্যভাগবত)

অবতারের জননী তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ঠিকই, তবে একমাত্র পরিচয় নয়। শচীমা একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যিনি 'আপনাতে আপনি বিকশি'। সন্তানস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে চৈতন্যদেবকে বৃহত্তর স্বার্থে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি, নিজের জীবনে অপরিসীম দুখের দহন মেনে নিয়ে সমাজের কলঙ্কমোচনে আত্মনিবেদন করেছিলেন।